STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

জানুয়ারি ২০১৯
নবপর্যায় ৬৯
মূল্য ১০ টাকা

চীনা প্রেসক্রিপশন

দ্বন্দ্বাত্মক রাজনীতি ত্যাগ করুন

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

সম্প্রতি শেষ-হওয়া একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রেশ যেন অশেষ। দেশ দুনিয়ায় এই নির্বাচন ও তার ফলাফল নিয়ে সবিশেষ ভাষ্য -ভাষণ অবিমিশ্র সন্তোষ-ভজনা আর তীক্ষ্ণ তীব্র সমালোচনার সুনামী নজর কেড়েছে চিন্তক ও বোদ্ধাদের- এ যেন এমন এক ছোট গল্প যা শেষ হয়েও হয় না শেষ। তামাম রাষ্ট্র নায়কদের মধ্যে অতীব দ্রুতলয়ে অভিনন্দনের বান ডাকতে, শোভন সময়সীমায় সতর্ক বাক্যবিন্যাসে অভিনন্দিত করতে কিংবা বিলম্বের বলয়ে অভিনন্দনকে রেওয়াজী পোষাকে সজ্জিত করতে লক্ষণীয় লক্ষণাদি দেশবাসী পরখ করেছে। 'বুঝহে সুজন যে জান সন্ধান-' তূল্য উক্ত আখ্যান নিরীক্ষা-বিক্ষণে অধম ও অনিরাপদ লেখক বারান্তরে যাওয়ার মোক্ষম সুযোগ খুঁজবে এইতো স্বভাবিক।

উপরোক্ত নির্বাচনী প্রতিক্রিয়াজাত তত্ত্বতালাস নিয়ে আলোচনার সুযোগ উপযুক্ত সময়ের শিকায় তুলে রেখে আসুন এক ব্যতিক্রমী রাষ্ট্রীয়' প্রতিক্রিয়ার প্রতি সজাগ সতর্ক সুতীক্ষ্ণ নজর রাখি।

রাষ্ট্রটির নাম চীন-মহাচীন। দুনিয়া কাঁপানো বিপ্লবের একটি নাম। কমরেড মাও সেতুং-এর নামাঙ্কিত সফল বিপ্লব সাধনার ফসল আজকের আধুনিক চীন। বিশ্বের অন্যতম প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্পদশালী এই রাষ্টের উচ্চ পর্যায় থেকে উচ্চারিত বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন নিয়ে ব্যতিক্রমী ও অনন্য পথসন্ধানী এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

চীনের গ্লোবাল টাইমস প্রচারিত Yu JINCUI লিখিত ৩রা জানুয়ারি প্রকাশিত 'Bangladesh Can Unleash more Potential by overcoming Partisan Politics' যার বঙ্গার্থ দাঁড়াবে 'দ্বন্দ্বাত্মক রাজনীতি অতিক্রমে বাংলাদেশ সম্ভাবনার সূচনা ঘটাতে পারে।' নিবন্ধটি কোনরূপ রাখঢাক না করে সোজাসাপ্টা কিছু প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির যুগান্তর সৃষ্টিকারী এক নাগাড়ে হ্যাট্রিক- করা এবং চতুর্থবারের নব নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

উক্ত নিবন্ধে বলা হয়েছে 'শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই তুতীয়াংশের বেশী ভোট পেয়ে ভূমিধস বিজয় অর্জন করেছে। এই বিজয় শেখ হাসিনাকে দেশ শাসনের সুযোগ দিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের বিরোধী দল তা প্রহসনমূলক ফলাফলের অভিযোগে প্রত্যাখান করেছে এবং নতুন ভোট দাবি করেছে।' একই সাথে বলা হয় 'আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন সহিংসতা এবং নানান অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে।'

'পশ্চিমা এই অভিযোগ বিরোধী দলের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদে ঘি ঢেলেছে।' নিবন্ধকার বলেছেন, একই সাথে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সামাজিক ক্রম পরিবর্তনের শিখরে উপনীত হয়েছে।' এক্ষেত্রে সুপারিশ করেছেন 'দেশটির জন্য রাজনৈতিক মেরুকরণ হ্রাসকরণ অতি প্রয়োজন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অতি জরুরী।' এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে যে 'দেশে দ্বন্দ্বাত্মক রাজনীতি সংকটজনক রূপ ধারণ করলে বাংলাদেশে পশ্চিমা হস্তক্ষেপের আমন্ত্রণ ঘটানো হবে।'

উক্তনিবন্ধে বলা হয় 'বাংলাদেশে ৭২ সনের সংবিধানে বহুদলীয় সংসদীয় গনতন্ত্রকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ..... তখন থেকেই অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতই নির্বাচন নিয়ে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছে, সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিজাত নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক -ঝড় চালু রয়েছে।' একথাও নিবন্ধে বলা হয় 'পশ্চিমা গণতন্ত্রের ভিতরে যে ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে তা বর্তমান সময়ে প্রকট হয়েছে।' .....'দলগুলো জাতীয় স্বার্থে নয়-দলগত ক্ষমতার স্বার্থে ক্রিয়াশীল।' আরও বলা হয়েছে 'বাংলাদেশের মতো একটা উন্নয়নশীল দেশে যেখানে রয়েছে একটি শক্তিশালী সরকার, রয়েছে কার্যকর শাসন ব্যবস্থা যা মেটাতে পারেড় উন্নয়নের দাবি অথচ বহুদলীয় গণতন্ত্রের নেতিবাচক প্রভাব একান্তই প্রবল।'

আরও বলা হয় 'চলতি ব্যবস্থাটির নেতিবাচক প্রভাবে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে, বাধাগ্রস্ত করতে পারে উন্নয়ন। এ সতর্কবাণী জানিয়ে বলা হয়, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সীমা ৭.৯% ছাড়িয়েছে-প্রতিবেশী ভারতের তুলনায় দ্রুততালে, যা আগামি পাঁচ বছরে শতকরা ১০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যসীমা ধার্য করেছে।' পাশাপাশি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ চীনের সাথে পৃষ্টা ২

সংখ্যালঘু কমিশন দ্রুত গঠিত হোক

অজয় দাশগুপ্ত

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। এবারের নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসন প্রথম থেকেই সচেতন ছিল। গণমাধ্যমেও বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছ। আওয়ামী লীগ তাদের 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শিরোনামের নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায় অংশে লক্ষ্য ও পরিকল্পনা হিসেবে বলেছে– 'অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্তাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে। সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার অবসান করা হবে।'

একাদশ জাতীয় সংসদে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে ১৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন। প্রত্যাশা থাকবে, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তারা বিশেষভাবে সচেষ্ট হবেন। এটা ঠিক যে জনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় সংসদে সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নেই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় এ ভূখন্ডে সংখ্যালঘুরা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। যেসব কারণে তাদের সংখ্যা গত সাত দশকে ১০ শতাংশে নেমে এসেছে তার অন্যতম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকা। নিরাপত্তাহীনতা তো রয়েছেই। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জমিজমা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেড়ে নিলে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায় না, আদালতে মামলা হয় না– এটাতো যুগ যুগ ধরে রেওয়াজ। এমনকি সামাজিক সমর্থনও সব সময় পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীরা অনেক সময় পাশে দাঁড়াতে ইতস্তত করে। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে সেই অর্পিত বা শত্রু সম্পত্তির দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক বোঝা বহন করে চলেছে সংখ্যালঘুরা। সংসদে তাদের জনসংখ্যার হিস্যা অনুযায়ী প্রতিনিধিত্ব নেই। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদেও যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নেই। একাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন এখনও বাকি। পৃষ্টা ২

নচিকেতার ছবি, বাংলাদেশের স্বাভাবিক চিত্র

শিতাংশু গুহ

নচিকেতার একটি ছবি প্রায়শঃ সামাজিক মাধ্যমে দেখি। খুব বেশিদিন পুরানো নয়, সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশে যান, সেই সুবাদে গ্রামের পৈতৃক ভিটা দর্শন করেন। ছবিটি বাপদাদার মাটির ভিটায় বসে ক্রন্দনের। পৃষ্টা ৪

সংখ্যালঘুরা শঙ্কাহীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম হয়েছে: ঐক্য পরিষদ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এ বারের নির্বাচনে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুরা শঙ্কাহীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম হওয়ায় সরকার, নির্বাচন কমিশনসহ সকল রাজনৈতিক দলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

গত ৪ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদ লিখিত বক্তব্যে বলেছে, ১৯৭৫-পরবর্তীতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত স্থানীয় ও জাতীয় প্রায় সব নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে যে বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতা এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রয়েছে তা নিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অন্যুন ৬ মাস আগে থেকে আমরা রাষ্ট্র, সরকার, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে আমাদের শঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে এসেছি। নির্ভয়ে-নির্বিঘ্নে তারা যাতে এবারের সংসদ নির্বাচনে তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগ এবং শঙ্কামুক্ত পরিবেশে নির্বাচনের পূর্বাপর বসবাস করতে পারে তজ্জন্যে সবাই যার যার অবস্থান থেকে এগিয়ে এসেছেন। এ জন্যে, আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে, আমরা তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাসগুপ্ত। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্যে বলা হয়, এবারই সর্বপ্রথম আমাদের পেশকৃত দাবিকে বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণার পর পরই জাতীয় দৈনিকসমূহে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, যাতে নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসনালয় নির্বাচনী কর্মকান্ডে ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িক প্রচার-প্ররোচনামূলক বক্তব্য, বিবৃতি প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়। এবারই প্রথমবারের মতো আমরা লক্ষ্য করেছি, এ দেশের সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের এ ঘোষণাবলীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে তা মেনে চলার সযত্ন প্রয়াস চালিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনে ও রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নতুনভাবে সূচিত হয়েছে যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের অবাধে ভোটদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

বক্তব্যে বলা হয়, আমরা এবারই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছি, নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যে পৃষ্টা ২

দ্বন্দ্বাত্মক রাজনীতি ত্যাগ করুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার সম্পর্ক অব্যাহত রাখায় সন্তোষ প্রকাশ করে চীন নবনির্বাচিত বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পর্ক অগ্রসর করে নিয়ে চীন- বাংলাদেশ স্ট্রাটেজিক সহযোগিতার অংশীদার করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। চীন একথাও মনে করে বাংলাদেশ 'রোড এন্ড বেল্ট' এর পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশ। চীন এদেশে ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে প্রধানত বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি ও জনগণের জীবনমান উন্নয়নে এবং কর্ম সংস্থান সৃষ্টির উপরিকাঠামো প্রকল্পে। রাজনীতিক স্থিতিশীলতা বাড়াতে ও দলগত সংঘাত কমাতে এবং রাজনৈতিক ঝুঁকি হ্রাসে 'রোড এন্ড বেল্ট' হবে সহায়ক।

উপরোক্ত যুক্তিপ্রদর্শন করে নিবন্ধকার প্রবন্ধের সমাপনী টেনেছেন এই মর্মে যে 'রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদদের জন্য সব চাইতে কার্যকর পথ হবে জনগণের সমর্থন আদায়- যেটা অবশ্যই রাজনৈতিক সংগ্রামে নয়, জনগনের ভাগ্য বদলের ভূমিকা পালনের মাধ্যমে।'

একথাও বাংলাদেশের মানুষ ভুলতে পারেনি যে, মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপরীতে পাকিস্তানের পক্ষে দৃঢ় সমর্থন প্রদান করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ পশ্চিমা শক্তিদের সাথে যুক্তভাবে। এছাড়া ৭৫- এ বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ক্ষমতার যে পটপরিবর্তন ঘটে তার এক মাসের মধ্যে চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানায়। লক্ষণীয় যে চীনে একনায়কত্ব সুলভ এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সম্প্রতি চীনা প্রধানমন্ত্রী আজীবন প্রধানমন্ত্রী পদে সমাসীন হয়েছেন। চীনের দেখানো ও শেখানো পথে বাংলাদেশকে হাটতে ইংগিতবহ সুপারিশ সম্পর্কে একটি বাক্যই যথেষ্ট-'সাধু সাবধান'।

সংখ্যালঘু কমিশন দ্রুত গঠিত হোক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমরা আশা করতে পারি যে, এ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব যেন যথাযথ পর্যায়ে থাকে, তার প্রতি নজর থাকবে।

শিক্ষায় সংখ্যালঘুরা অনেক এগিয়ে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘুদের নিয়োগ-পদোন্নতির সমস্যা অনেকটাই লাঘব হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে প্রার্থী হিসেবে আরও বেশি মনোনয়ন প্রদান করা হবে, এটাই প্রত্যাশা।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নিরলস কাজ করে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের ময়দানে কেউ কাউকে বিন্দুমাত্র জায়গা ছেড়ে দেয় না। তৃণমূলে শক্ত ভিত গড়ে তুলতে পারলেই কেবল জাতীয় সংসদ কিংবা স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নলাভ সম্ভব। আর এটা শুধু আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে নয়, বিএনপি-জাতীয় পার্টিসহ সব দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আওয়ামী লীগ তাদের ইশতেহারে সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের অঙ্গীকার করেছে। অচিরেই এ কমিশন গঠিত হবে, এটাই প্রত্যাশা। কমিশনের যেন প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকে এবং তার সুপারিশ-পদক্ষেপ বাস্তবায়নে যেন গরিমসি না হয়, সেটা নিশ্চিত করা চাই। এ বিষয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিতদের যেমন উদ্যোগী হতে হবে, তেমনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব থেকেও দিতে হবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা।

চট্টগ্রামে হিন্দু ফাউণ্ডেশনে বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী'র জন্মদিনের আয়োজনে শ্রদ্ধাঞ্জলি পরিষদ বার্তা

চট্টগ্রামে বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী'র জন্মদিন উদ্‌যাপিত

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

উপমহাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের সহযোদ্ধা এবং চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের অকুতোভয় সৈনিক, সাবেক আইন পরিষদ সদস্য বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর জন্মদিন যথাযথ মর্যাদায় বাংলাদেশ হিন্দু ফাউণ্ডেশন মিলনায়তনে উদ্‌যাপন করা হয়। গত ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশ হিন্দু ফাউণ্ডেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী-র প্রতিকৃতিতে পুষ্প মাল্য অর্পন, জন্মদিনের কেক কাটা, আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ হিন্দু ফাউণ্ডেশনের আয়োজনে জন্মদিন উপলক্ষে বাংলাদেশ হিন্দু ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান দুলাল কান্তি মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী একজন দেশপ্রেমিক, সমাজহিতৈষী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার আলোকিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বক্তারা আরো বলেন; মাষ্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী সহযোদ্ধা, নির্লোভ, কৃতিপুরুষ বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী আমাদের কাছে আজীবন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী, লায়ন কে পি দাশ, অধ্যক্ষ বিজয় লক্ষ্মী দেবী, নারায়ণ কৃষ্ণ গুপ্ত, প্রকৌশলী উদয় শেখর দত্ত, অধ্যাপক নারায়ণ কান্তি চৌধুরী, বিশ্বজিৎ পালিত, আশুতোষ সরকার, অজিত কুমার আইচ, বিপুল কান্তি দত্ত, বিকাশ মজুমদার, তন্ময় সেনগুপ্ত, সত্যজিৎ পালিত, প্রসূন নাগ, মতিলাল দেওয়ানজী, রিমন মুহুরী, রতন কুমার দাশ, প্রকৌশলী লিটন ব্যানার্জী, টিংকু চক্রবর্তী, সুবল চন্দ্র দাশ, মনোরঞ্জন দাশ, চন্দন কুমার চৌধুরী, স্বপন সেনগুপ্ত, পরিমল ঘোষ, চন্দন কুমার দত্ত, সুমন চন্দ্র নাথ, সুকুমার মজুমদার, অরুণ চৌধুরী।

সংখ্যালঘুরা শঙ্কাহীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম হয়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। উক্ত পত্রের পরিপোষকে আইন-শৃংখলা কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সংস্থা পৃথক পৃথকভাবে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করে তাদের শঙ্কার কারণ জানার চেষ্টা করার পাশাপাশি নিরাপত্তার ঝুঁকিতে যাতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের পড়তে না হয় তার জন্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়াস নিয়েছিলেন। এরপরও আমরা জানি, নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে ফেনীর সোনাগাজী, ঠাকুরগাঁও-র সদর উপজেলা, ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলা, পিরোজপুরের স্বরূপকাঠিসহ বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অনাকাংখিত ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা মোকাবেলায় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, দুর্বৃত্তদের কাউকে কাউকে আটকও করেছেন, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। এতে সংখ্যালঘু জনমনে আশা ও আস্থা ফিরে আসতে শুরু করেছে। সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে এ জন্যে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এবারকার নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্টভাবে তার নির্বাচনী ইশতেহারে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, মাদক নির্মূলের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও জিরো টলারেন্সের অঙ্গীকার করেছেন। আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে এ জিরো টলারেন্সের ঘোষণা যাতে আক্ষরিকভাবে কার্যকর হয় তার জন্যে ভবিষ্যতের সরকারের প্রতি আমরা আকুল আহ্বান জানাই।

আমরা মনে করি, এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের এক বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রশংসনীয় ভূমিকা ও উদ্যোগের জন্যে আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল এ সুযোগকে কাজে লাগাতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন- এ প্রত্যাশা আমরা করছি।

ঐক্য পরিষদ বলেছে, রাজাকার, স্বাধীনতা বিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত পার্লামেন্ট এবারের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গঠিত হতে যাচ্ছে। এ পার্লামেন্টকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আশা করি, পার্লামেন্টের সরকারি দল ও বিরোধী দল ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় সুস্পষ্টভাবে যে অঙ্গীকারসমূহ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করেছে আমরা তা যথার্থভাবে পালনে তাদের ভূমিকা পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে প্রত্যক্ষ করবো-এ প্রত্যাশা করতে চাই। আশা করি, রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ কোনভাবেই জনগণকে নিরাশ করবেন না।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা সংসদ নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। আজকের এ সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা তাঁকে এজন্যে বিনম্র অভিনন্দন পৃষ্ঠা ৭

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া না থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবরটি বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

একান্ত সাক্ষাৎকারে ঊষাতন তালুকদার

সবাইকে আস্থায় এনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান করতে হবে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অন্যতম শীর্ষ নেতা ঊষাতন তালুকদার বলেছেন, গত চার দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীরা সংখ্যালঘু হয়ে গেছে। নিজ বাসভূমি থেকে তাদের বিতাড়িত করে বহিরাগতদের নিয়ে এসে এখানে পুনর্বাসিত করার সুদূপ্রসারী এই লক্ষ্য যদি অব্যাহত থাকে, তবে অচিরেই আদিবাসীরা এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তাঁর আশংকা, নিজ ভূমে পুরোপুরি পরবাসী হবে তারা।

এক একান্ত সাক্ষাৎকারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি ঊষাতন তালুকদার তিন পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ির চিত্র তুলে ধরে বলেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় এই পার্বত্য ভূমিতে আদিবাসী স্থানীয়দের সংখ্যা ছিল ৯৭ দশমিক ৫০ শতাংশ, ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসনে ১৯৭১ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে ৭৫ শতাংশে। বহিরাগতদের এখানে এনে পুনর্বাসিত করার ফলে বর্তমানে রাঙামাটিতে স্থানীয় আদিবাসীদের সংখ্যা নেমে এসেছে ৫১ শতাংশ, বহিরাগত ৪৯ শতাংশ, বান্দরবনে স্থানীয় ৪৫ শতাংশ বহিরাগত ৫৫ শতাংশ এবং খাগড়াছড়িতে প্রায় সমান সমান। বান্দরবন থেকে স্থানীয়দের উৎখাত করে বিতাড়নের প্রবণতা এখন ব্যাপক।

তালুকদারের অভিযোগ, সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের একটা বড় অংশ আদিবাসীদের বিতাড়ন করে আরও বহিরাগতদের এনে পার্বত্যভূমিতে পুনর্বাসিত করতে চায়। এই লক্ষ্যে মিথ্যা মামলা, অস্ত্র হাতে গুঁজে দিয়ে মামলা দায়ের, তল্লাশি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনেক কর্মী ও সমর্থককে এ কারণে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষও দিনে-রাতে যে কোন সময়ে বাড়িঘরে ও ব্যক্তিগতভাবে তল্লাশির ভয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। যথাযথভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নিজেদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাত করার ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হচ্ছে।

ঊষাতন তালুকদার বলেন, দীর্ঘ সংঘাত শেষে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির চেতনা ছিল স্থানীয় আদিবাসীদের শাসনতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব ও জায়গা-জমির মালিকানাপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু কোনোটাই হয়নি, যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সরকার বলছে চুক্তির মোট ৭৮টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু কার্যত ২৫টি ধারার বেশি বাস্তবায়িত হয়নি। তাও গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কোন ধারা নয়। জনসংহতি নেতা বলেন, পার্বত্য মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহকে মতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃংখলা, স্থানীয় পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্াপনা এবং বন ও পরিবেশসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্থানীয় কর্তৃপরে কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইন যুগোপযুগীভাবে সংশোধন করা হলেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের এখনো কোনো বিধিমালা না হওয়ায় এবং প্রয়োজনীয় জনবল ও অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় কার্যক্রমই চলছে না। ঊষাতন বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সরকারের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে। এই সরকারকেই আমরা বলছি, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে সরকারের নীতি পুনর্বিবেচনা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বিভাজন করে নয়, সবাইকে আস্থায় এনে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠা বা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতার গুজবে কান না দিয়ে পার্বত্য সমস্যার সমাধান করতে হবে।

এক একান্ত সাাৎকারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি ঊষাতন তালুকদার তিন পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ির চিত্র তুলে ধরে বলেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় এই পার্বত্য ভূমিতে আদিবাসী স্থানীয়দের সংখ্যা ছিল ৯৭ দশমিক ৫০ শতাংশ, ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসনে ১৯৭১ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে ৭৫ শতাংশে। বহিরাগতদের এখানে এনে পুনর্বাসিত করার ফলে বর্তমানে রাঙামাটিতে স্থানীয় আদিবাসীদের সংখ্যা নেমে এসেছে ৫১ শতাংশ, বহিরাগত ৪৯ শতাংশ, বান্দরবনে স্থানীয় ৪৫ শতাংশ বহিরাগত ৫৫ শতাংশ এবং খাগড়াছড়িতে প্রায় সমান সমান। বান্দরবন থেকে স্থানীয়দের উৎখাত করে বিতাড়নের প্রবণতা এখন ব্যাপক।

ঊষাতন তালুকদার বলেন, ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার পর গণতান্ত্রিক ধারায় আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি, স্বায়ত্বশাসনের দাবি জানাই। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন এনে তিন পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবনে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এদের জমি দেয়া হয় স্থানীয় নিয়ম নীতি ভঙ্গ করে, জমি কবুলিয়ত দেয়া হয়, যার কারণে অনেক পার্বত্যবাসীর বন্দোবস্তকৃত ও দখলীকৃত জমিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরি হয় স্থানীয়দের মধ্যে। 'আন্ডারগ্রাউন্ডে' গিয়ে প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আমাদের বিকল্প ছিল না।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সংঘাতে জনসংহতির পাঁচশোরও বেশি কর্মী প্রাণ হারিয়েছে, সাধারণ মানুষ মারা গেছে ১৫ হাজারের মতো।

ষাটের দশকে ফিরে গিয়ে ঊষাতন তালুকদার বলেন, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ১৯৬০ সালে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের অংশ হিসেবে কাপ্তাই বাঁধ দেওয়ার পর রাঙামাটির পার্বত্য ভূমির ৫৪ হাজার একর ধান উৎপাদনের জমি জলমগ্ন হয়ে যায়। সরকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করায় ক্ষতিগ্রস্তরা ত্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম করে, পরে তাদের অরুণাচল রাজ্যে নিয়ে যাওয়া নয়। ওই সময়ে তাদের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজারের মতো। নিশ্চয়ই এখন সংখ্যা বেড়েছে। পরবর্তী সময়ে সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ১৯৮৬ সালে আরও ৬৭ হাজার আদিবাসী পার্বত্য ভূমি ছেড়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়। ১৯৯৫-১৯৯৬ সালের দিকে তাদের ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়, ১৯৮৭ সালে পার্বত্য চুক্তি সই হওয়ার পর তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশ এখনো পুনর্বাসিত হতে পারেনি। খাস জমি অথবা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে তাদের বসবাস করতে হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসা ও অন্যান্য গোষ্ঠীর তৎপরতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ঊষাতন তালুকদার বলেন, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা) নামে দু'টি গোষ্ঠী কাজ করছে। সংঘাত বাড়ছে, সম্প্রতি অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। জনসংহতি (লারমা) নেতা নানিয়াচর উপজেলা চেয়ারম্যান শক্তিমান চাকমাসহ বেশকিছু নেতাকর্মী নিহত হয়েছে, আহতও অনেক। তবে ঊষাতন তালুকদার অভিযোগ করেন, এই দুই গোষ্ঠীর প্রতিই সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে।

বর্ণমালা 'হিন্দুর অক্ষর'?

রামেন্দু মজুমদার

আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরে কী পরিমাণে সাম্প্রদায়িক ও পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন মানুষ সুকৌশলে আমাদের শিশু-কিশোর-তরুণদের মনকে বিষিয়ে তুলছে, তার সাম্প্রতিক একটি নজির পাঠকদের সামনে তুলে ধরতেই এই লেখা।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডের বাংলা (সৃজনশীল) প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্রের ৩ নম্বর সেটের 'খ' বিভাগের ৫ নম্বর প্রশ্নে লেখা হয়েছে:

'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী টিনা কথায় কথায় বন্ধুদের সাথে ইংরেজি বলে। তারা ইংরেজি ভালো বলতে পারে না বলে সে তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তার বন্ধু রাখি বলে, তোমার মতো বিদেশ ভাষাপ্রীতি স্বভাবের মেয়ের সাথে আমার বন্ধুত্বের কোনো প্রয়োজন নেই। এ কথা বলে সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

(ক) কারা হিন্দুর অক্ষরকে হিংসা করে?

প্রশ্নকর্তা 'হিন্দুর অক্ষর' বলতে নিশ্চয়ই বাংলা বর্ণমালাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু একজন সরলমনা শিক্ষার্থী এ প্রশ্নে কী বুঝবে? রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের বিরোধিতাকারীরা পাকিস্তান আমলে বাংলাকে 'হিন্দুদের' ভাষা বলে ঠিক যেভাবে চিহ্নিত করতে চাইত, এ যেন তারই প্রতিধ্বনি। প্রশ্নকর্তা আরও এক ধাপ এগিয়ে বাংলা বর্ণমালাকে 'হিন্দুদের অক্ষর' বলেছেন।

আমাদের জিজ্ঞাসা, এ প্রশ্নপত্র একাধিক শিক্ষক মিলে করেছেন, প্রশ্ন করার পর অন্য শিক্ষকেরা মিলে মডারেশন করেছেন। এই গুরুতর বিষয় কারও নজরে এল না? নাকি সবাই একজোট হয়ে কাজটি করেছেন?

আমরা মনে করি, রাষ্ট্রভাষার এ ধরনের অবমাননা রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল। পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে ক্লাসে পড়ানো, প্রশ্ন করা– সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাম্প্রদায়িক করে তোলার একটি ষড়যন্ত্র কার্যকরভাবে চালানো হচ্ছে। এ প্রবণতা যদি রোধ করা না যায়, তবে সরকারের সব প্রাগ্রসর পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। পাকিস্তানপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তিই আমাদের সমাজটাকে দখল করে নেবে।

আমাদের দাবি, এ প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের বিচারের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হোক এবং তাঁদের চিরতরে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে কালো তালিকাভুক্ত করা হোক। এ ব্যাপারে আমরা ক্ষিশা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ প্রত্যাশা করি। (পুনর্মুদ্রিত)

বিচিন্তা

জ্যাঠামণিকে যেভাবে দেখেছি

রানা দাশগুপ্ত

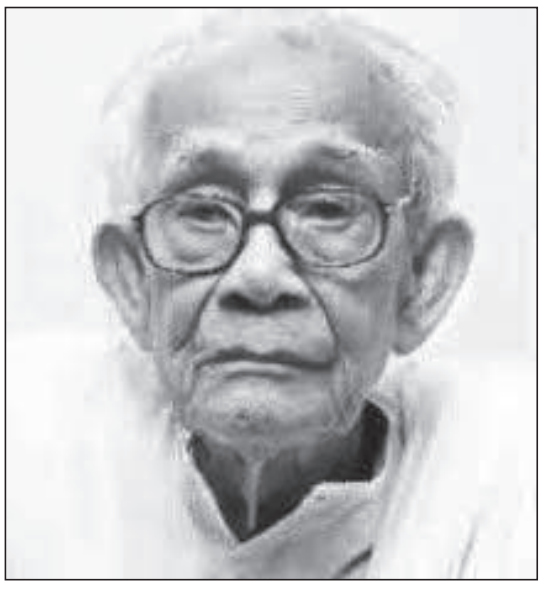

[১০ জানুয়ারি বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর জন্মদিন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জন্মদিন স্মরণে প্রকাশিত হলো এই নিবন্ধ-সম্পাদক]

বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীকে 'জ্যাঠামণি' বলেই ডাকতাম। যে পরিবারে জন্ম আমার সে পরিবারেই জন্মেছিলেন বীরকন্যা প্রীতিলতা। তা-ই সেই ছোটবেলা যখন থেকে খানিকটা বুঝতে শিখেছি তখন থেকে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের গল্প শুনেছি। সে সাথে শুনেছি মাষ্টারদা সূর্য সেন, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং-র সাথে বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর কথা। জালালাবাদ যুদ্ধে গলার এক পাশে গুলি লেগে আহত হলেও তিনি মারা যান নি। ভারী রোমাঞ্চকর মনে হতো তখন।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরুর পর বিপ্লবী বিনোদ চৌধুরীকে 'ভারতীয় এজেন্ট' হিসেবে চিহ্নিত করে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিয়ে যায়। কিছুদিন পর আমার বাবাকেও। যুদ্ধ শেষ হবার বছরখানেক পর দু'জনেই বেরিয়ে আসেন চট্টগ্রাম কারাগার থেকে আরো কয়েকজনের সাথে। এর কয়েক দিন পর বাবা আমাকে নিয়ে বিপ্লবী বিনোদ বিহারীর বাসায় গেলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন। সস্নেহে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে-ই হলো তাঁর সথে আমার প্রথম পরিচয়। বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী বাবাকে ছোট ভাই-র মতো স্নেহ করতেন। দু'জনের মধ্যে ছিল গভীর সখ্যতা।

আইনজীবী পিতার সন্তান ছিলেন বিনোদ চৌধুরী। শৈশবে পিতাকে হারিয়েছেন। কৈশোরে পদার্পণের আগে মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন এর পর থেকে ক্রমশঃ-ই গোটা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম এর বাইরে ছিল না। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্যে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু'র আত্মত্যাগের ধারায় সিক্ত হয়ে কোলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ বৃটিশ গভর্নরের উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে শহীদ হন বিনয়, বাদল, দীনেশ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 'অহিংস' ধারার পাশাপাশি 'সহিংস ধারায় ভারতের মুক্তি'-এ চিন্তাধারায় বাংলায় গড়ে ওঠা বিপ্লবী 'যুগান্তর' বিনোদ চৌধুরী দলের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন সেই ছোটবেলায়-চট্টগ্রাম কলেজে এফএ (আইএ) ক্লাশে ভর্তির পর। গোপনে তাঁরই সহপাঠী বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের (পরে ফাঁসিতে মৃত্যু) কাছে গোপনে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করেন, যোগ দেন মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী দলে। মাস্টারদা তখন একদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-র চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক, অন্যদিকে গোপন বিপ্লবী দলের প্রধান। ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে যে ক'জন চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করে বৃটিশ ইউনিয়নের জ্যাক পতাকা নামিয়ে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পতাকা উত্তোলন করে মাস্টারদা'কে রাষ্ট্রপতি হিসেবে গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী ছিলেন তাঁদেরই একজন। ১৯৩০ সালের ১৮ থেকে ২২ এপ্রিল-এ ৪ দিন চট্টগ্রামকে গোটা ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে স্বাধীন রাখার যে ইতিহাস সে ইতিহাসের অন্যতম ধারক তিনি। ঐতিহাসিক জালালাবাদ যুদ্ধে আহত হয়েও তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। বৃটিশ সরকার জীবিত বা মৃত তাঁকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে ৫০০/-র পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন।

বৃটিশের কারাগারে থাকাবস্থায় বিপ্লবী বিনোদ বিহারী তাঁর ছাত্রত্ব শেষ করেন। এমএ পাশ করে বিএল ডিগ্রি নিলেও কখনো আইনপেশায় যোগ দেননি কিংবা কোন কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেন নি। নিজ বাসভবনে কোমলমতি শিশুদের পাঠদান করে যা পেতেন তা দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। কারো কাছে হাত পাতেন নি তিনি। এমনকি তাঁর অসুস্থতার সময়েও।

ইংরেজ আমলের মতো পাকিস্তানি আমলেও দীর্ঘকাল তিনি কারান্তরালে কাটিয়েছেন। আজন্ম দেশের মানুষের মুক্তির সাধনা করেছেন। অল্পাহারী সাধারণ জীবন যাপন করতেন তিনি তাঁর পর্ণকূটিরে।

বৃটিশের কারাগারে থাকাবস্থায় বিপ্লবীদের অনেকেই 'কম্যুনিস্ট পার্টির' রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়লেও বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী ছিলেন তার ব্যতিক্রম। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী হিসেবে সে-ই যে কংগ্রেসী রাজনীতির সাথে যুক্ত হলেন আজন্ম সে-ই রাজনীতির ভাবাদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করে মানবসেবায়, সমাজসেবায় পথ চলেছেন। তিনি সর্বদা ন্যায় ও সত্যকে ধারণ করে অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে অবিচল থেকেছেন। ক্ষমতার বা অর্থের প্রলোভন তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করতে পারে নি।

বৃটিশ আমলের শেষ দিকে কংগ্রেস দলের সদস্য হিসেবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ধর্মীয় দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে 'পাকিস্তান' নামক উগ্র সাম্প্রদায়িক কৃত্রিম রাষ্ট্র থেকে অনেকে দেশত্যাগ করলেও, তিনি শত প্রতিকুলতার মাঝেও দেশের মাটি ও মানুষকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হিসেবে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলীবর্ষণে শহীদদের আত্মাহুতির পর যে ক'জন সদস্য পার্লামেন্টে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চায় হয়েছিলেন তার মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন বিনোদ বিহারী চৌধুরী। ভাষার দাবিতে, স্বাধীনতার লড়াইতে চট্টগ্রামে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালনের পাশাপাশি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনকে সংগঠিত করেন। এ ব্যাপারে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথেও সাক্ষাত করেন বিনোদ বিহারী চৌধুরী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করতেন,'দাদা' হিসেবে সম্বোধন করতেন। ১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী অরাজকতার সময় তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে তাঁকে নিজের জীবন নিয়ে সাবধান থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে সখেদে বলেছিলেন, 'দাদা, বাঙালিরা আমাকে মারতে পারে না।' ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে খুন হওয়ার পর এক সভায় তিনি বলেছিলেন,'ওরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করে নি গোটা জাতিকে হত্যা করেছে।'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করতেন,'দাদা' হিসেবে সম্বোধন করতেন। ১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী অরাজকতার সময় তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে তাঁকে নিজের জীবন নিয়ে সাবধান থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে সখেদে বলেছিলেন, 'দাদা, বাঙালিরা আমাকে মারতে পারে না।' ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে খুন হওয়ার পর এক সভায় তিনি বলেছিলেন,'ওরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে-ই হত্যা করে নি গোটা জাতিকে হত্যা করেছে।'

স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনীতির সাথে যুক্ত না থাকলেও তিনি রাজনৈতিক অনাচার, ব্যভিচার ও দুর্বৃত্তপণার বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। সব ধরণের হিপোক্রেসী, শঠতা ও কপটতার বিরুদ্ধে ছিলেন সদা সোচ্চার। ৭৫-পরবর্তী রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাম্প্রদায়িক পালাবদল কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি তিনি। ধর্মীয়-বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলনে নেতৃত্ব তিনি দিয়েছেন তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লড়াইকেও তিনি এগিয়ে নিতে সদা সচেষ্ট থেকেছেন। বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী তাঁর অতীত জীবনের মহৎ কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে শুধু চট্টগ্রামের নয়, গোটা জাতির অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করেছিলেন।

শুধু এপার বাংলায় নয়, ওপার বাংলায়-ও তিনি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তা-ই ত' কোলকাতায় ১০৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর পর পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর মরদেহকে সামনে রেখে শ্রদ্ধায় নতজানু হয়েছিলেন, সেই মরদেহ ঢাকা বিমান বন্দরে বিমান থেকে নামানোর পর তাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর পক্ষ থেকে। ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের হাজারো জনতার ফুলেল শ্রদ্ধা জানানোর পর প্রয়াত বিপ্লবীর মরদেহ তাঁর জন্মভূমি চট্টগ্রামে নেয়ার জন্যে হেলিকাপ্টারেরও ব্যবস্থা করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। চট্টগ্রামে নেয়ার পর শুধু গার্ড অব অনার-ই তাঁকে দেয়া হয় নি, হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে অযুত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তাঁর মরদেহ দাহ হয়েছিল স্থানীয় অভয়মিত্র মহাশ্মশানে। ৮০-র দশক থেকে প্রয়াত বিপ্লবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ হয়েছিল আমার। মৃত্যুতেও হেলিকপ্টারে মরদেহের সাথে সহযাত্রী ছিলাম ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে। সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে গিয়েছিলেন তাঁর এপিএস, বর্তমানে সাংসদ সাইফুজ্জামান শিখর ও সাংসদ পংকজ নাথ।

বিপ্লবী বিনোদ বিহারী ছিলেন বিপ্লবী যুগের শেষ নক্ষত্র। তাঁর মৃত্যুতে সেই নক্ষত্রেরও পতন ঘটে। বিপ্লবী যুগের সাথে আজকের যুগের তিনি-ই ছিলেন শেষ মেলবন্ধন। আজ তিনি ইতিহাসের কিংবদন্তী।

নচিকেতার ছবি, বাংলাদেশের স্বাভাবিক চিত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তার ডান পা মাটিতে ছড়ানো, বা-পা হাঁটু গেড়ে; ডান হাত মাটিতে, পাঁচটি বলিষ্ঠ আঙ্গুল পৃথক ও প্রসারিত, বাঁ-হাত দিয়ে বাঁ-চোখ মুছছেন, ডানচোখ বন্ধ। মলিন মুখমণ্ডলে দুঃখের ছাপ স্পষ্ট।

কণ্ঠশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই, সবাই তাকে চেনেন। তার আদি বাড়ি ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার চেচ্নিয়াপুর গ্রামে। তিনি ভিআইপি। বাংলাদেশ সফরে এলে হেলিকপ্টারে নিজ বাসভূমে যান এবং ভিটায় বসে কিছুক্ষণ কান্না করেন, হয়তো কান্না করে মনের দুঃখ হালকা করার চেষ্টা করেন।

ঐ ভিটায় এখন বসবাস করেন জনৈক আনোয়ার শিকদার। ক'হাত বদলে তিনি মালিক জানি না, বা তাঁর কোন দোষ আছে, তাও নয়, কিন্তু এটিই বাংলাদেশের স্বাভাবিক চিত্র। সাতচল্লিশে এখনকার বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডে অনেক বাড়িই ছিলো হিন্দুর। এখন সম্পূর্ণ উল্টো। শুধু ভারত-ভাগ কি এর কারণ ? না।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ যদি শুধুমাত্র কারণ হতো, তাহলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আগরতলা বা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সব মুসলমানের বাড়ি হিন্দুর হয়ে যেতো। তা হয়নি। এই চিত্র পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের। সাদামাটাভাবে যে কেউ হয়তো বলবেন, পাকিস্তান নামক একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পত্তন এর কারণ। আসলেই কি তাই?

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়, কেউ বলে না। সেখানে প্রতিনিয়ত হিন্দুর সম্পত্তি জোরপূর্বক হাতছাড়া হচ্ছে। হিন্দুরা দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। এর কারণ, রাষ্ট্রযন্ত্রটি সাম্প্রদায়িক। ওপরের স্তরের মানুষগুলো, বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবী বর্ণচোরা, সাম্প্রদায়িক। অনেকে আবার ইসলামপন্থী গণতান্ত্রিক। বাপদাদার ভিটে হারিয়েছেন। বিশেষতঃ যারা হারাতে বাধ্য হয়েছেন। এ যন্ত্রণার ব্যথা শুধু হৃদয় দিয়েই বোঝা যায়। সরকারে ভালো লোক যে নেই, তা নয়, তাঁরা খুব একটা কিছু করতে পারেন না।

বাংলাদেশ নব্বই শতাংশ মুসলমানের দেশ,

পৃষ্ঠা ৭

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন

[১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম কারাগারে মাস্টারদা সূর্য সেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কার্যত এটি ছিল হত্যাকান্ড। সেই দিনটি স্মরণে এই নিবন্ধ প্রকাশ করা হলো– সম্পাদক]

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছিল, অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছিল দেশের মাটি– সুদূর চট্টগ্রামে তখন স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেন টগবগ করা দুঃসাহসী কিছু তরুণ, যার নেতৃত্ব দেন মাস্টারদা সূর্য সেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামের তরুণ বিদ্রোহীদের এই জ্বলে ওঠা গোটা দেশকে পথ দেখায়। দক্ষিণের এই স্ফুলিঙ্গ দোর্দন্ড প্রতাপ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। চট্টগ্রামে এই যুববিদ্রোহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছিল।

এই বিদ্রোহের মহানায়ক একজন স্কুল শিক্ষক, গণিত পড়াতেন তিনি। জন্ম রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে এক অস্বচ্ছল পরিবারে ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ জন্ম। পিতার নাম রাজমণি সেন, মাতা শশীবালা সেন। রাজমণি সেনের দুই ছেলে, চার মেয়ে। সূর্য সেন এই পরিবারের চতুর্থ সন্তান। অন্য ভাই কমল। চার বোন বরদাসুন্দরী, সাবিত্রী, ভানুমতি ও প্রমিলা। শৈশবে পিতাকে হারান সূর্য সেন, মানুষ হন কাকা গৌরমণি সেনের কাছে। সূর্য সেন ছেলেবেলা থেকেই ধর্মপ্রাণ ও খুব মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। চট্টগ্রামের দয়াময়ী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। পরে তিনি নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর ন্যাশনাল হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯১২ সালে চট্টগ্রামের নন্দনকাননে অবস্থিত হরিশ দত্ত ন্যাশনাল হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে এফ এ (ফার্স্ট আর্টস) এ ভর্তি হন। সূর্য সেন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ এ পরীক্ষা সাফল্যের সাথে পাশ করে একই কলেজে বি এ-তে ভর্তি হন। কিন্তু তৃতীয় বর্ষে কোনো এক সাময়িক পরীক্ষায় ভুলক্রমে টেবিলে পাঠ্যবই রাখায় তাকে চট্টগ্রাম কলেজ ত্যাগে বাধ্য করা হয়। তিনি বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকেই বিএ পাশ করেন। এই কলেজে অধ্যয়নকালে সূর্য সেন বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। বিপ্লবীদের গোপন ঘাঁটি নামে পরিচিত এই কলেজেই তিনি অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে আসেন। চট্টগ্রামে ফিরে যোগ দেন বিপ্লবী দলে।

৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের নগেন্দ্রনাথ সেন ১৯১৮ সালে চট্টগ্রামে এসে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও চারুবিকাশ দত্তের সঙ্গে দেখা করেন। সূর্য সেন এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী অম্বিকা চক্রবর্তী একই থানার পাশাপামি গ্রামের হওয়ায় আগে থেকেই পরস্পরের পরিচিত ছিলেন। এ সময় সূর্য সেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য হরিশ দত্তের জাতীয় স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি দেওয়ানবাজারে বিশিষ্ট আইনজীবী অন্নদা চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময় বিপ্লবী দলের তার সম্পর্ক আরও গভীর হয় এবং শিক্ষকতা করার কারণে তিনি মাস্টারদা নামে পরিচিত হন। পরে বিদ্যালয়টি উঠে যায়।

মাস্টারদা সূর্য সেন ১৯১৯ সালে বোয়ালখালির কানুনগোপাড়ার নগেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা ষোল বছরের পুষ্প দত্তকে বিয়ে করেন। মাস্টারদা মনে করতেন, বিবাহিত জীবন তাকে কর্তব্যভ্রষ্ট করবে, আদর্শচ্যুত করবে। ফলে আত্মীয়-স্বজনের চাপে পড়ে বিয়ে করলেও স্ত্রীর সংসর্গ এড়িয়ে চলতেন।

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে অনেক বিপ্লবী এই আন্দোলনে যোগ দেন। সূর্য সেনও অসহযোগে যোগ দেন। তবে গান্ধীজীর অনুরোধে বিপ্লবীরা তাদের কর্মসূচি এক বছরের জন্যে বন্ধ রাখেন। মহাত্মা ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলে বিপ্লবী দলগুলো আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। মাস্টারদা বিপ্লবীদের সংগঠিত করেন। তখন চট্টগ্রাম কোর্টের ট্রেজারি থেকে পাহাড়তলীতে অবস্থিত আসাম, বেঙ্গল রেলওয়ে কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন নিয়ে যাওয়া হতো। ১৯২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর টাইগার পাস মোড়ে সূর্য সেনের বিপ্লবী সংগঠনের কর্মীরা দিনের আলোয় বেতন নিয়ে যাওয়ার সময় ১৭,০০০ টাকার বস্তা ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনার প্রায় দুসপ্তাহ পর গোপন বৈঠকের সময় কোনো সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। দুপক্ষে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়, যা ইতিহাসে 'নাগরখানা পাহাড় খন্ডযুদ্ধ' নামে পরিচিত। মাস্টারদা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তার খোঁজে পুলিশ তোলপাড় করে সারা

দেশ। অবশেষে ১৯২৬ সালের ৮ অক্টোবর মাস্টারদা সূর্য সেন কলকাতায় আমহার্স্ট স্ট্রীটের এক মেসে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। মাস্টারদাকে মেদিনীপুরে সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। পরে সেখান থেকে পাঠানো হয় বর্তমান মুম্বাইয়ের রত্নগিরি জেলে। এই সময় মাস্টারদার স্ত্রী টাইফয়েডে আক্রান্ত হন। দেওয়ানবাজারের যে বাসা থেকে মাস্টারদা পালিয়ে গিয়েছিলেন , তার স্ত্রী সেখানেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দিনদিন অবস্থার অবনতি ঘটছে। বহুবার লিখিত আবেদনের পর মাস্টারদাকে কঠোর পুলিশ পাহাড়ায় রত্নগিরি থেকে চট্টগ্রাম আনা হয়। স্ত্রীর শিয়রে তখন মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী বহুবার অনুযোগ করতেন বিপ্লবের মন্ত্রে তাকে দীক্ষিত করতে। স্বামীকে কাছে পাওয়ার জন্যেই তার এই সাধনা। কিন্তু তা সত্বেও তিনি নেতা-স্বামীর দেহ-মনের সান্নিধ্য পাননি। মাস্টারদা কারাগার থেকে ছাড়া পান ১৯২৮ সালের শেষ দিকে।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে সূর্য সেনের ফাঁসির মঞ্চ। বাংলাদেশ সরকার এটি একটি স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে সংরক্ষণ করছে।

১৯২৮ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে চট্টগ্রাম থেকে যে প্রতিনিধিদল যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, নির্মল সেন, লোকনাথ বল, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রমুখ। ওই অধিবেশন চলাকালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে সূর্য সেনের বৈঠক হয়। ১৯২৯ সালে মহিমচন্দ্র দাস এবং সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালের গোড়া থেকেই সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী আসকার দিঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত কংগ্রেস অফিসে বসে ভবিষ্যতে সশস্ত্র বিপ্লবের রূপরেখা নিয়ে বিপ্লবী নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। সেসময় তারা আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের দলের নাম পরিবর্তন করে রাখেন ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চিটাগাং ব্রাঞ্চ। বাংলায় ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা। বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের বিষয়টি তখন প্রধান সমস্যা হিসেবে আলোচিত হয়। এ লক্ষ্যেই সিদ্ধান্ত হয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের। দিন স্থির হয় ১৮ এপ্রিল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী চারটা বাড়ি থেকে বিপ্লবীদের চারটি দল বের হয়। সীতাকুন্ডে ধুম স্টেশনে রেল লাইনের ফিস প্লেট খুলে রাখা হয়েছিল, সে রাতেই একটি মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে উল্টে যায়। চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় গোটা দেশ থেকে। অন্য একটি দল নন্দনকাননে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সব যন্ত্রপাতি ভেঙে দেয়। তারপর পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় দল পাহাড়তলীতে অবস্থিত চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করে নেয়। উন্নত মানের রিভলবার ও রাইফেল তুলে নিয়ে অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করা হয়। তবে সেখানে কোনো গুলি পাওয়া যায়নি। চতুর্থ দল দামপাড়ায় পুলিশ রিজার্ভ ব্যারাক দখল করে নেয়। এই অভিযানে অংশ নেওয়া বিপ্লবীরা দামপাড়া পুলিশ লাইনে সমবেত হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং সামরিক কায়দায় অধিনায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনকে গার্ড অব অনার দেন। মাস্টারদা অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন। বিপ্লবীদের এই চতুর্মুখি অভিযানের পর চট্টগ্রাম বৃটিশ শাসন থেকে চারদিন স্বাধীন ছিল।

বৃটিশ বাহিনী সংগঠিত হয়ে ২২ এপ্রিল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের পর বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে (বর্তমানে সেনানিবাসের পাহাড়) অবস্থান নিয়েছিল। সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে আক্রমণ চালায়। দু'ঘন্টার প্রচন্ড লড়াইয়ে বৃটিশ বাহিনীর ৭০ থেকে ১০০ জন প্রাণ হারায়। অপরদিকে ১২ জন বিপ্লবী শহীদ হন।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের দিন বিপ্লবীদের আর একটি পরিকল্পনা ছিল পাহাড়তলী ইউরোপীয় কাব আক্রমণ, কিন্তু ঐদিন গুড ফ্রাইডে থাকায় ঐদিন ক্লাবে কেউ ছিল না। তাই পরিকল্পনা পাল্টাতে হয়। মাস্টারদা এই ক্লাবে আক্রমণের দিন স্থির করেন ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার এই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাতে দলের বিপ্লবী সদস্যদের নিয়ে প্রীতিলতা ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। ঐ অভিযানে ৫৩ জন ইংরেজ হতাহত হয়েছিল। গুলিতে আহত প্রীতিলতা ধরা পড়ে দৈহিকভাবে অত্যাচারিত হওয়ার চাইতে স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নেন। তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনসহ ছয় শীর্ষ বিপ্লবী নেতাকে ধরার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করে ইংরেজরা। ১০০০০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। সূর্য সেন গৈরলা গ্রামে ক্ষীরোদ প্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে মাস্টারদা সেখানে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক উপস্থিত ছিলেন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত, ব্রজেন সেন ও সুশীল দাশগুপ্ত। ব্রজেন সেনের সহোদর নেত্র সেন পুরস্কারের লোভে সূর্য সেনের উপস্থিতির কথা পুলিশকে জানিয়ে দেন।

পৃষ্ঠা ৬

মাস্টারদা সূর্য সেনের শেষ চিঠি

আমার শেষ বাণী- আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলছে। এই তো সাধনার সময়। বন্ধুরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার এই তো সময়। ফেলে আসা দিনগুলোকে স্মরণ করার এইতো সময়।

কত মধুর তোমাদের সকলের স্মৃতি। তোমরা আমরা ভাই-বোনেরা তোমাদের মধুর স্মৃতি বৈচিত্রহীন আমার এই জীবনের একঘেঁয়েমিকে ভেঙ্গে দেয়। উৎসাহ দেয় আমাকে। এই সুন্দর পরম মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য দিয়ে গেলাম স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। আমার জীবনের এক শুভ মুহূর্তে এই স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জীবনভর উৎসাহভরে ও অক্লান্তভাবে পাগলের মতো সেই স্বপ্নের পেছনে আমি ছুটেছি। জানি না কোথায় আজ আমাকে থেমে যেতে হচেছ। লক্ষে পৌঁছানোর আগে মৃত্যুর হিমশীতল হাত আমার মতো তোমাদের স্পর্শ করলে তোমরাও তোমাদের অনুগামীদের হাতে এই ভার তুলে দেবে, আজ যেমন আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার বন্ধুরা-এগিয়ে চল, এগিয়ে চল- কখনো পিছিয়ে যেও না। পরাধীনতার অন্ধকার দূরে সরে যাচ্ছে। ওই দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার নবারুণ। কখনো হতাশ হয়ো না। সাফল্য আমাদের হবেই। ভগবান তোমাদের আশীবার্দ করুন।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম ইস্টার বিদ্রোহের কথা কোনও দিনই ভুলে যেও না। জালালাবাদ, জুলখা, চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সব সময় মনে রেখো। ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে যেসব দেশপ্রেমিক জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের নাম রক্তাক্ষরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লিখে রেখো।

আমাদের সংগঠনে বিভেদ না আসে- এই আমার একান্ত আবেদন। যারা কারাগারের ভেতরে ও বাইরে রয়েছে, তাদের সকলকে জানাই আমার আশীর্বাদ। বিদায় নিলাম তোমাদের কাছ থেকে।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
বন্দেমাতরম।

[১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ চট্টগ"ামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে জন্ম নেয়া শ্রীসূর্যকুমার সেন ওরফে মাস্টার সূর্য সেনের এই ছিলো শেষ চিঠি। বৃটিশ সরকারের আইনে সাজা পাওয়া সূর্য সেন ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসির ৫ ঘন্টা পূর্বে সন্ধ্যা ৭ টায় এ চিঠি লেখেন।]

চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন

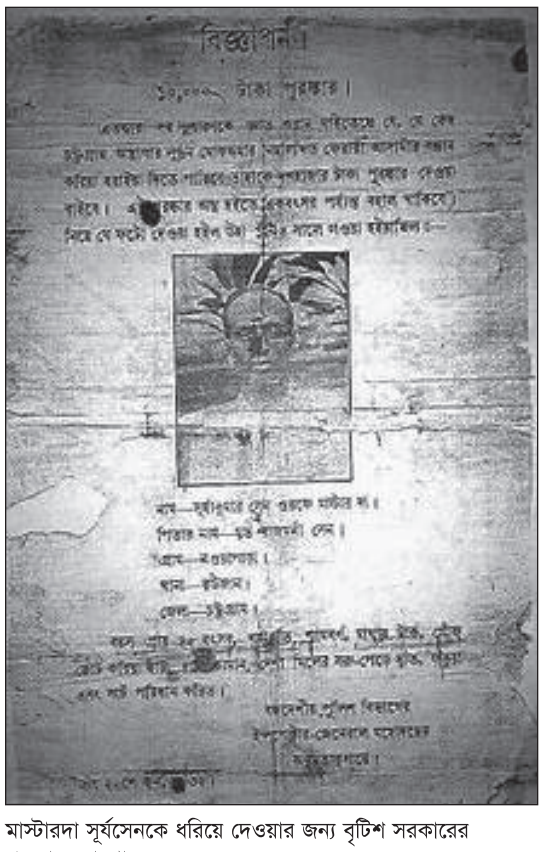

মাস্টারদা সূর্যসেনকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বৃটিশ সরকারের পুরস্কার ঘোষণা

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

রাত প্রায় ১০টার দিকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী বাড়ি ঘিরে ফেলে। রাতের অন্ধকারে গুলি বিনিময়ের মধ্যেই কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। রাত দুটোর দিকে সূর্য সেন ও ব্রজেন সেন অস্ত্রসহ ধরা পড়েন। সেই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ সূর্য সেনের নিজের লেখা অর্ধসমাপ্ত আত্মজীবনীর খাতা 'বিজয়া' উদ্ধার করে। বিচারের সময় এই 'বিজয়া'র লেখাই মাস্টারদার বিরুদ্ধে বিপ্লব ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে সূর্য সেন ও ব্রজেন সেনকে চট্টগ্রাম জেলা গোয়েন্দা সদর দপ্তরে, পরে কোর্টে হাজির করার পর চট্টগ্রাম কারাগারে নেওয়া হয়।

মাস্টারদা সূর্য সেন গ্রেপ্তার হওয়ার পর তারকেশ্বর দস্তিদার দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষের পর তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে বিপ্লবীরা কারাগার থেকে সূর্য সেনকে মুক্ত করার জন্য কয়েকবার চেষ্টা চালান। কিন্তু তাদের গোপন পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিচারের জন্যে ইংরেজরা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১/১২১এ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে ১৯৩৩ সালের ১৫ জুন মামলার কাজ শুরু হয়। তবে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা ছাড়া আর কোনো অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়নি। মামলার রায় ঘোষণা করা হয় ১৯৩৩ সালের ১৪ আগস্ট। ট্রাইব্যুনাল সূর্য সেনকে ১২১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রাণদন্ডের আদেশ দেয়। একই ধারায় তারকেশ্বর দস্তিদারেরও প্রাণদন্ড হয়। কল্পনা দত্তকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদন্ড। তিন বিপ্লবী হাসিমুখে দন্ডাদেশ গ্রহণ করেন এবং বিপ্লব ও স্বাধীনতার স্লোগান দিতে দিতে আদালত ত্যাগ করেন। তিন বিপ্লবীর পক্ষে এই দন্ডাদেশের বিরবদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করা হয়। কিন্তু হাইকোর্টও ১৪ নভেম্বর দেওয়া রায়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রায় বহাল রাখে।

মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত মাস্টারদাকে কড়া পাহাড়ায় কনডেমড সেলে রাখা হতো। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি মধ্যরাতে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। কার্যত এই বিপ্লবীকে হত্যা করে বৃটিশ সরকার। জানা যায়, সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আগে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তাদের দাঁত ও হাড়-গোর ভেঙে দেওয়া হয়। পরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। ফাঁসির পর সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের লাশ তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। হিন্দু ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী দাহ করার সুযোগও দেওয়া হয়নি। জানা যায়, দুই বিপ্লবীর লাশ কারাগার থেকে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরের ৪ নম্বর স্টিমার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর বৃটিশ ক্রুজার 'দ্য রিনাউন' এ তুলে দেওয়া হয়। লাশের বুকে লোহার টুকরো বেঁধে ভাসিয়ে দেওয়া হয় সাগরজলে। মৃত বিপ্লবীদেরও নিরাপদ মনে করেনি বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা।

সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে বৃটিশ সরকার হত্যা করলেও বিপ্লবের আগুন নেভানো যায়নি। দক্ষিণের এই স্ফুলিঙ্গ স্বাধীনতার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ঐক্য পরিষদের সভায়

তৃতীয় কলামের পর

ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ্যাড. রাণা দাশগুপ্ত, কাজল দেবনাথ, মিলন কান্তি দত্ত, নির্মল রোজারিও, মনীন্দ্র কুমার নাথ, এ্যাড. তাপস পাল, নির্মল চ্যাটার্জী, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়, অধ্যক্ষ হরিচাদ মন্ডল সুমন, এ্যাড. শ্যামল কুমার রায়, এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মন্ডল, উত্তম চক্রবর্তী, সাগর হালদার, হেমন্ত আই কোড়াইয়া, দীপংকর ঘোষ প্রমুখ, উপস্থিত চিলেন।

একটি পরিদর্শন রিপোর্ট

নোয়াখালীতে দু'টি গণধর্ষণ, খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে দেশ ছাড়ার হুমকি

॥ উত্তম চক্রবর্তী ॥

জাতীয় নির্বাচনের পরে নোয়াখালীতে ২টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। একটি সুবর্ণচর, অন্যটি কবিরহাট। কোম্পানিগঞ্জে একটি হিন্দু বাড়িতে খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে অতি দ্রুত তাদের দেশত্যাগের হুমকি দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, কোম্পানিগঞ্জে বাড়িটি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বাড়ির সংলগ্ন।

নির্বাচনে ওবায়দুল কাদের জয়ী হওয়াতে বসুরহাট বাজারে কাদের পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ ভৌমিক পরিবার মিষ্টি বিতরণ করেন, সে বাড়িরই মিষ্টি দোকানদার বসুরহাট বাজারে ব্যবসা করেন। তাকে দুই দিনের মৌখিক নোটিশ দিয়ে ঘরের মালিক দোকান ছেড়ে দিতে বলেন। অথচ সে ঘরের অনুকূলে অগ্রিম জমা সাত লাখ টাকা, মাসিক ভাড়া বিশ হাজার টাকা। দোকান না ছাড়ার কারণে হিন্দু ভদ্রলোককে তার কর্মচারী সহ দোকানের মধ্যে তালা বন্ধ করে ভিতরে আটক রাখা হয়। এক দিন পর ফেনী হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা সাংবাদিক যতন মজুমদার কোম্পানিগঞ্জের মেয়র এবং থানাকে জানানোর পর উদ্ধার করা হয়।

কবিরের হাট যাই ধর্ষিতা পারভীন আক্তারকে দেখতে। পারভীন আক্তার ও তার আশে পাশের লোকজন মারফত বিস্তারিত জানলাম, পারভীন আক্তার এর স্বামী যুবদল নেতা আবুল হোসেন, তাকে মিথ্যা মামলায় জেলে পাঠিয়ে যুবলীগ নেতা জহির ও ছাত্রলীগ নেতা জাকের তাদের বন্ধুদের নিয়ে গণধর্ষণ করেন। কবিরহাট থানার ওসি ধর্ষিতার পরনের কাপড় পরিবর্তন করে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য পাঠান, যেন কোন আলামত না পাওয়া যায়।

এটি নৃশংস, হিংস্র ও পৈশাচিক ছাড়া কিছুই হতে পারে না। নির্যাতিত মহিলার নির্বাক ও বোবা কান্না, তার তিন সন্তানের কি হবে? আমি মনে করি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় সুবর্নচর ও কবিরহাটের ঘটনায় সম্প্রতি গৃহবধুকে গণধর্ষণের ঘটনাগুলো একই সূত্রে গাঁথা। এ সবের প্রতিটি ঘটনার সঙ্গেই সরকারি দলের নেতাকর্মীরা জড়িত ছিল। যে ঘটনায় মামলার প্রধান আসামি ধানসিঁড়ি ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি জাকের হোসেন জহির ১৬৪ ধারায় ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন সেখানে ডাক্তারি রিপোর্টে ধর্ষণের আলামত না পাওয়া খুবই দুঃখজনক।

অন্যদিকে ঠাকুরগাঁও-১, নির্বাচনের পরে যে সংখ্যালঘু দশম শ্রেনির ছাত্রী, পাশের বাড়িতে বান্ধবীর থেকে নোট বই আনতে যাওয়ার সময় গণধর্ষণের শিকার হয়, মেয়েটি নিতান্তই গরীর, দিন আনে দিন খায়, মামলা ও হয়েছে। সেখানেও দেখা যাচ্ছে সবাই সরকারি দলের নেতা। এ অপকর্মের হোতা, আসামী ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তারা স্বীকারও করেছে।

পুলিশ বলছে এ কাজ করতে হলে স্থানীয় এম.পি বলতে হবে, নতুবা সাম্প্রদায়িক ইস্যুর সৃষ্টি হবে। জেলা ঐক্য পরিষদ ধর্ষিতার পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য দিয়েছে। স্থানীয় এম.পি আদৌ কোন সাহায্য সহায়তা করেন নাই।

ঐক্য পরিষদের সভায়

সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

সম্প্রতি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় স্থায়ী কমিটির সভায় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তত পাঁচজনকে মনোনয়ন দেয়ার জন্যে সরকারি দলের কাছে দাবি জানিয়ে বলেছে, এ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হলে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র অনেকটা এগিয়ে যাবে।

সভায় আগামি উপজেলা নির্বাচনে যোগ্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু প্রার্থীরা যাতে নির্বাচিত হয়ে জাতির সেবায় নিয়োজিত হতে পারে তা নিশ্চিতের জন্যেও সকল রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। কলাম ২

নচিকেতার ছবি, বাংলাদেশের স্বাভাবিক চিত্র

চার পৃষ্ঠার পর

এ বাক্যটি সবার মুখেই শুনবেন! সরকারকে এখানে বলতে হয়, দেশ মদিনা সনদে চলবে। ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আইন হবে না। বাহাত্তরের সংবিধান ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রধর্ম ওঠানো যাবে না, সংবিধানের ললাট থেকে 'বিসমিল্লাহ' ওঠায় সাধ্য কার? ক্ষমতায় থাকতে বা আসতে এদেশে মৌলবাদের সাথে আপোষ করতে হয়।

কলকাতায় জয়শ্রী-আলমগীরের বিয়ে হয়েছিলো মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে, মিডিয়া ফলাও করে তা ছেপেছিলো। ঢাকার কোন বুদ্ধিজীবীর বাড়িতে কি উল্টোটা সম্ভব? সম্ভব নয়। এতে অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে। আর ইসলামের অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার মিথ্যা অভিযোগে ইতিমধ্যে রামু, নন্দীরহাট, নাসিরনগর, রংপুর ও অন্যত্র হাজারো হিন্দুর বাড়িঘর পুড়ে ছাই, দেশত্যাগীদের সংখ্যা অগুণতি। সংখ্যালঘু নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে বাংলাদেশে ইসলামি অনুভূতি, নাবালিকা ধর্ষণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, লুটপাট, সম্মানহানি খুবই কার্যকর।

এসব কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে এখনো প্রতিদিন হিন্দুর সংখ্যা কমছে। বাহাত্তরে ১৯.৭% থাকলেও এখন হিন্দু ৯%। সংখ্যালঘু ১০.৭%, এটি সরকারি হিসাব, গোঁজামিল দেয়া। বাংলাদেশের মানুষ বলতে পছন্দ করেন যে, দেশটিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নহর বইছে। তাঁরা আরো বলতে চান, হিন্দুরা এমনিতেই ভারত চলে যাচ্ছেন। কট্টরপন্থীরা বলেন, 'হিন্দুরা আমানত'। আমানতের শাব্দিক অর্থ যাই হোক, প্রকৃত মানে হচ্ছে, 'গৃহস্থের মুরগী পোষা'।

নচিকেতা বিখ্যাত মানুষ, তাই তাঁর ছবি মিডিয়ায় এসেছে। এই ছবি লক্ষকোটি হিন্দুর প্রতিচ্ছবি। 'ন্যাশন্স লাষ্ট ক্যজাল্টি' বই বলছে, সাতচল্লিশ থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৫ কোটি হিন্দু পূর্ব-পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এতবড় উদ্বাস্তু ঘটনার কিন্তু তেমন কোন প্রচার বা গুরুত্ব নেই। এই তালিকায় নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন, পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বর্তমান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, শিল্পী নচিকেতা সবাই আছেন।

এদের কান্নাকাটি, বা নীরব বিলাপ মাঝে-মধ্যে দেখা বা শোনা যায়। সাধারণ যারা গেছেন, তাদের মুখেও প্রায়শ: অনেকেই শুনে থাকবেন তারা কতবড় জমিদারি ফেলে গেছেন। কিন্তু কেন তাঁরা যেতে বাধ্য হয়েছেন, তা কিন্তু বলেন না। অমর্ত্য সেন প্রায়শ: বাংলাদেশের প্রশংসা করেন, যা বাংলাদেশী হিসাবে শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু কেন তিনি বাপ্-ঠাকুরদার হাত ধরে দেশ ছেড়েছিলেন তা বলতে লজ্জা পান? বা বললে সাম্প্রদায়িক হয়ে যাবেন, বা এরপর বাংলাদেশ সফরে গেলে সমাদর কমে যাবে।

না, দাদা তা কমবে না। কারণ আপ্যায়নে আমাদের মানে বাংলাদেশিদের জুড়ি নেই। আমাদের সুবিখ্যাত জামদানি শাড়ি, বা পদ্মার ইলিশ অতীতের সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারে। তাই কলকাতার বাবুরা অনেকে বা অভিনেত্রী রুপা গাঙ্গুলী চব্বিশ ঘণ্টা ঢাকায় কাটিয়ে সার্টিফিকেট দিতে পারেন যে, বাংলাদেশের হিন্দুরা ভালো আছে। পশ্চিমবাংলা বা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ভুলেও বাংলাদেশের হিন্দুদের কথা মুখে আনেন না। দিদিকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, কলকাতার মেয়র একজন মুসলমান, ঢাকা বা করাচীতে একজন হিন্দু মেয়র কি চিন্তা করা যায়?

এ এক চমৎকার খেলা। কবি শ্রীজাত লাঞ্ছিত হয়েছেন, সবাই অসহিষ্ণুতা দেখতে পাচ্ছেন। তসলিমা নাসরিনকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার সময় কোন অসহিষ্ণুতা ছিলো না! ফারুক আব্দুল্লাহ এতদিন পর ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন দেখছেন। কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের মেরেকেটে বিদায়ের সময় কোন ধর্মীয় বিভাজন ছিলো না? ব্রিগেডে যারা লম্বা ভাষণ দিয়েছেন, এরাও কেউ বাংলাদেশের হিন্দুদের কথা ভাবেন না। ভারত আমার দেশ নয়, ভারত নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই।

কলকাতায় জয়শ্রী-আলমগীরের বিয়ে হয়েছিলো মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে, মিডিয়া ফলাও করে তা ছেপেছিলো। ঢাকার কোন বুদ্ধিজীবীর বাড়িতে কি উল্টোটা সম্ভব? সম্ভব নয়। এতে অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে। আর ইসলামের অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার মিথ্যা অভিযোগে ইতিমধ্যে রামু, নন্দীরহাট, নাসিরনগর, রংপুর ও অন্যত্র হাজারো হিন্দুর বাড়িঘর পুড়ে ছাই, দেশত্যাগীদের সংখ্যা অগুণতি। সংখ্যালঘু নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে বাংলাদেশে ইসলামি অনুভূতি, নাবালিকা ধর্ষণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, লুটপাট, সম্মানহানি খুবই কার্যকর। এসব কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে এখনো প্রতিদিন হিন্দুর সংখ্যা কমছে। বাহাত্তরে ১৯.৭% থাকলেও এখন হিন্দু ৯%। সংখ্যালঘু ১০.৭%, এটি সরকারি হিসাব, গোঁজামিল দেয়া। বাংলাদেশের মানুষ বলতে পছন্দ করেন যে, দেশটিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নহর বইছে। তাঁরা আরো বলতে চান, হিন্দুরা এমনিতেই ভারত চলে যাচ্ছেন। কট্টরপন্থীরা বলেন, 'হিন্দুরা আমানত'। আমানতের শাব্দিক অর্থ যাই হোক, প্রকৃত মানে হচ্ছে, 'গৃহস্থের মুরগী পোষা'।

আমার না থাকলেও, অনেকের আছে। ভারতের রামমন্দির ঘটনায় বাংলাদেশে হাজারো মন্দির পোড়ে, হিন্দু দেশচ্যুত হয়? 'হজরত বাল' চুরি যাওয়ার মিথ্যা প্রচারণায় পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক হামলায় অসংখ্য হিন্দু মরেছে। পাকিস্তান হিন্দুশূন্য হয়েছে, অত্যাচার ছিলো, আরো ছিলো ভারতের উদাসীনতায়। বাংলাদেশও হিন্দুশূন্য হবে বিশেষতঃ ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজনীতিকদের অতিমাত্রায় মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে এরা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে 'প্রকাশ্যে গরু খাওয়া ও মুসলিম তোষণ' পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।

নচিকেতার কান্নার মূল্য তিনিই বুঝবেন যিনি নচিকেতারা অবশ্য সব বুঝেও কথা বলেন না, পাছে সাম্প্রদায়িক হয়ে যান? সাম্যের গান গাওয়া ভালো, তবে এটাও সত্য 'শান্তির জন্যে মাঝেমধ্যে যুদ্ধের প্রয়োজন'। আইসিস, আল-কায়দা'কে ভালবাসার গান শুনিয়ে শান্তি আসে না।

যাহোক, লোকে বলে, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বুঝতে হলে আপনাকে হিন্দু হতে হবে, নইলে বোঝা কঠিন, অন্যকে বোঝানো আরো কঠিন। তবে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তু হিন্দুরা কেন বোঝেন না, তা রহস্যময়। হয়তো বোঝেন, বলেন না, কারণ স্বজাতির পক্ষে বললে সাম্প্রদায়িক ছাপ পড়তে পারে! নেতাজী সুভাষ বসু ছিলেন আগাগোড়া অসাম্প্রদায়িক। নিজেকে প্রগতিশীল ও অসম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে কবির সুমন-দের মত ভণ্ডামীর প্রয়োজন হয়নি তাঁর।

বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বা সংখ্যালঘুরা বিতাড়িত হচ্ছেন, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বা নির্যাতনের কারণে। এটি নীরব সন্ত্রাস। রাষ্ট্রের কাঠামোটি সাম্প্রদায়িক।

সংখ্যালঘুরা শঙ্কাহীনভাবে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

জানাই। আমরা আশা করছি, তাঁর-ই সুমহান নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা শুধু অব্যাহত-ই থাকবে না, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আপামর বাঙালি জাতির যে আকাংখা তা পুরণ হবে। একই সাথে আমরা নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্যকেও জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মহানগর পরিবার দিবস অনুষ্ঠিত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ২৫ জানুয়ারি দিনভর অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে মহানগর পরিবার দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন মজুমদার। উদ্বোধন করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ হাজী মোহাম্মদ সেলিম, ভারতীয় হাইকমিশনের কাউন্সিলর (রাজনৈতিক) রাজেস উইকি, পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জী।

পরলোকে মনোরঞ্জন মুখার্জী

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার নওপাড়াই ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাতক্ষীরা জেলার সভাপতি মনোরঞ্জন মুখার্জী (মনি) গত ২৬ জানুয়ারি সকালে বার্ধক্য জনিত কারনে ৮১ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলনকান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়।

মত বিনিময় সভার আগে ফুলের শুভেচ্ছা — পরিষদ বার্তা

রাঙামাটিতে ঐক্য পরিষদের মতবিনিময় সভা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

সম্প্রতি রাঙামাটিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক মতবিনিময় সভায় সংগঠনের কর্মতৎপরতা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও 'পরিষদ বার্তা' সম্পাদক বাসুদেব ধর। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদ রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি ডা. শিবপ্রসাদ মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন ঐক্য পরিষদ রাঙামাটি শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি ইন্দ্র দত্ত তালুকদার, সহ-সভাপতি দীপন কুমার ঘোষ ও অরূপ মুৎসুদ্দী, সাংগঠনিক সম্পাদক শ্যামল দেব, সদস্য রবীন্দ্রনাথ (মাস্টার), পলাশ কুসুম চাকমা, লোমা লুসাই, জ্যোতি পাংঘোয়া, শ্যামল মিত্র চাকমা এবং মহিলা সম্পাদিকা মহতী চাকমা।

সভায় পার্বত্য জেলার সংখ্যালঘুদের ছেলেমেয়েদের চাকরি নিশ্চিত করা এবং জেলা পরিষদ, উন্নয়ন বোর্ড, পৌরসভা ও উপজেলায় সদস্য মনোনয়নের আহ্বান জানানো হয়।

পিহর গীতা সংঘ মন্দির উদ্বোধন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ৮ জানুয়ারি কুমিল্লা জেলার চান্দিনায় পিহর গ্রামে পিহর গীতা সংঘ মন্দির উদ্বোধন করা হয়। মন্দির উদ্বোধন করেন কুমিল্লা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্য স্বামী বিশ্বেশ্বর আনন্দ মহারাজ। বিশিষ্ট শিল্পপতি আগাতা গ্রুপের চেয়ারম্যান হিমাংশু বিকাশ ভৌমিক। ধর্মানুরাগী ও দেশপ্রেমিক শ্রী ভৌমিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে উজবেকিস্তানের তাসখন্দ ও সিঙ্গাপুরে অবস্থান করলেও দেশের টানে এবং স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মচর্চার সুবিধার্থে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানে সহযোগিতার জন্য তিনি এই এলাকায় স্থাপন করেছেন আগাতা ফিড মিলস নামে একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চান্দিনা উপজেলা চেয়ারম্যান তপন কুমার বকশি। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ পঙ্কজ নাথ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ, বাসুদেব ধর, মিলন কান্তি দত্ত, মঞ্জু ধর, ডি এন চ্যাটার্জি ও জয়ন্তী রায়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয়ক মনীন্দ্র কুমার নাথ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. শ্যামল কুমার রায়, যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি পঙ্কজ কুমার সাহা ও সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. তাপস কান্তি বল, বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের সভাপতি সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য ও সাধারণ সম্পাদক দিপালী চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন পঙ্কজ নাথ।

এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে মন্দির প্রতিষ্ঠা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাহস যোগাবে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে উল্লেখ করে বক্তাগণ এভাবে বিত্তবান বিশিষ্ট জনদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত পরিষদ বার্তা

ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের টেলিকনফারেন্স

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ১২ জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক সময় সকাল ৯টা পর্যন্ত প্রায় আড়াই ঘন্টা ব্যাপী হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের টেলিকনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই টেলিকনফারেন্স এ অংশ গ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, সহ সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয়ক মনীন্দ্র কুমার নাথ, সাংগঠনিক সম্পাদক দীপঙ্কর ঘোষ। যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সঞ্চালনায় এই টেলিকনফারেন্স-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

মূলত নির্বাচন পূর্ব টেলিকনফারেন্সের ধারাবাহিকতায় এই টেলিকনফারেন্সের মূল বিষয় ছিল সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও বহির্বিশ্ব কমিটিগুলোর সার্বিক ও সার্বক্ষণিক সংযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা যাতে বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতনের চিত্র প্রকাশ পায়, দোষীদের বিচারের আওতায় আনা যায়, নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়।

টেলিকনফারেন্সে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাসগুপ্ত নির্বাচন পূর্ব এবং পরবর্তী সংখ্যালঘুদের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে বহির্বিশ্বের ঐক্য পরিষদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। কেন্দ্রীয় কমিটির কঠোর পরিশ্রমের ফলে এবার নির্বাচনোত্তর সহিংসতা অনেকটাই কম হয়েছে, আশানুরূপ না হলেও সংসদে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে। এই প্রথম নির্বাচন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন নির্বাচনে ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার না করা এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত রাখতে সফল হয়েছেন। তিনি আরো বলেন যে, এই প্রথম সরকার, প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন ঐক্য পরিষদের সাথে যোগাযোগ রেখে নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপদে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন। তাঁর মতে ডিসেম্বর ২০১৮-এর নির্বাচন সংখ্যালঘুদের জন্য ১৯৭০ এর নির্বাচনের মতোই নিরাপদ ছিল। তবে আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভ করার মতো এখনো অবস্থা হয়নি। আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে। তবে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠনের অঙ্গীকার করেনি যদিও বি এন পি ও জাতীয় পার্টি সে অঙ্গীকার করেছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ টেলিকনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সকল নেতৃবৃন্দ সহ যারা দেশের বাইরে থেকেও দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের কথা ভুলে যাননি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত -এর সঠিক, সাহসী ও যোগ্য নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কানাডা ঐক্য পরিষদের ডঃ অনুরাধা বোস কানাডার আইনসভায় পেশ করা মেমোরেন্ডাম এর বিষয় তুলে ধরেন এবং এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, সে কারণে কানাডার হাই কমিশন ঢাকায় ঐক্য পরিষদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখে। এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপীয়ান ঐক্য পরিষদের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সংরক্ষিত নারী আসনে অন্যূন ৫ সংখ্যালঘুকে মনোনয়নের আহ্বান

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের তিন সভাপতি মেজর জেনারেল (অব) সি আর দত্ত বীর উত্তম, সাবেক এমপি উষাতন তালুকদার ও হিউবার্ট গোমেজ এবং সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তত পাঁচজন প্রতিনিধিকে মনোনয়ন দেয়ার জন্যে সরকারি দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, এ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হলে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র অনেকটা এগিয়ে

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২